Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 212 –218
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী': উদ্বাস্তু সমস্যার এক করুণ আলেখ্য

অশ্বিনী শর্মা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : aswinisharma.mng@gmail.com

Keyword
Salil Sen, Natun Ihudi, Partition, Migration, Refugee, Identity, Crisis, Consequence etc.

Abstract
The partition is one of the biggest curse in Indian and Bengali life.This divission brought dire consequences to the lives of common people.One of the consequences of this partition is refugee problem.This problem also forced economically well-off families to fall by the wayside. Salil sen's 'Natun Ihudi' is one such play written on the thorny issue of refugee.The common people of East Pakistan who suffered various atrocities due to partition are known as 'Natun Ihudi' in this play.Standing in the midst of decaying values Manamohan Bhattacharjee's family moves to kolkata in search of new light and new hope. The dramatist has presented a pathetic and realistic picture of the refugee problem by focusing on this one family, showing the suffering of ordinary people like Manamohan Bhattacharjee.The main article will focus on the refugee problem based on 'Natun Ihudi' play.

Discussion
দেশভাগ হল ভারতীয় তথা বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। এই দ্বিখণ্ডন সাধারণ মানুষের জীবনে এক করুণ পরিণতি নিয়ে এসেছিল। এই দেশভাগের অনিবার্য ফলশ্রুতি হল উদ্বাস্তু সমস্যা। আর এই উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে একথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি 'Refugee' শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে। একটি হল 'শরণার্থী' যার আক্ষরিক অর্থ হল এমন কোনো ব্যক্তি যিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শরণ নিয়েছেন অর্থাৎ আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের শরণার্থী মর্যাদাবিষয়ক সম্মেলনে 'শরণার্থী'-র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি একজন ব্যক্তি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন ও দেখতে পান যে, তিনি জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক আদর্শ, সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় তাকে ওই দেশের নাগরিকের অধিকার থেকে দূরে সরানো হচ্ছে, সেখানে ব্যাপক ভয়-ভীতির পরিবেশ বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র তাকে যথার্থ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তখনই তিনি 'শরণার্থী' হিসেবে বিবেচিত হন। অন্য প্রতিশব্দটি হল 'উদ্বাস্তু' যার অর্থ গৃহহীন। বেদের যুগে 'বাস্তু'(বাড়ি) শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ ছিল। বাংলায় প্রায় 'ভিটা' বা 'ভিটে' শব্দের সঙ্গে জুড়ে উল্লেখ করা হয়, যেমন 'বাস্তুভিটে'। আবার এই ভিটার সঙ্গে সংস্কৃত 'ভিত্তি' শব্দটির নিবিড় যোগ আছে। সুতরাং 'বাস্তুভিটা' শব্দটি বুঝিয়ে

দেয় বাড়ির ভিত্তি বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে পূর্বপুরুষ অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক বংশধারার একটি যোগসূত্র রয়েছে। আর 'উদ্বাস্তু' মানে সেই ভিত বা ভিত্তি থেকে চ্যুত হওয়া।

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) নামক সংস্থায় 'Refugee' র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> "a refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. A refugee a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries."[১]

এই সংজ্ঞা থেকে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এখানে উদ্বাস্তুদের গৃহত্যাগের কারণগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত জাতিগত হিংসা, ধর্মীয় উন্মাদনা, রাজনৈতিক সংঘাত, জাতীয়তাবোধের অভাব এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সাধারণত নিরাপত্তাহীনতাই বাস্তুভিটা ত্যাগের প্রধান কারন। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব হলে মানুষ তার দীর্ঘদিনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ফল হয় হিতে বিপরীত। এই অসহায় মানুষগুলি একটুখানি আশ্রয় ও নিরাপত্তার পরিবর্তে ভোগ করেছে চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ-কষ্ট।

মানব জীবনে বাস্তুভিটার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ সবকিছু হারালেও এই বসতবাড়ি হারাতে চায় না। সেই আদিমকাল থেকেই বাস্তুভিটার সঙ্গে মানুষের একটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু দেশভাগের ফলে নিরুপায় হয়ে মানুষকে সেই প্রিয় বসতবাড়িকে হারাতে হল। আশ্রয় হারিয়ে মানুষ ছিন্নমূল অবস্থায় পাড়ি দিল কখনো একই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, আবার কখনো ভিন্নদেশে। আশ্রয় পেল অপরিচিত দেশের নোংরা বস্তিতে, স্টেশনে, রাস্তার ধারে। আশ্রয়হীন এইসব মানুষজনের কাছে স্বাধীনতার অর্থবোধ হল বাস্তুচ্যুত হওয়া। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছিল পশ্চিমবাংলায়। কিন্তু অন্য দেশে এসে গৃহহীন এই সব মানুষেরা উপলব্ধি করলো তারা অবাঞ্ছিত, অতিরিক্ত। একদিকে সরকারী উদাসীনতা, অন্যদিকে স্থানীয় মানুষদের অবহেলায় এই সব উদ্বাস্তু মানুষদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। যদিও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে, তবে সেই সাহায্য সবার কাছে পৌঁছয়নি। মিজানুর রহমান তাঁর 'দেশবিভাগ বাংলা নাটক' গ্রন্থে উদ্বাস্তুদের একটি পরিসংখ্যানে[২] দেখিয়েছেন,

১৮৪৬—১৯৫০ সাল পর্যন্ত এদেশে এসেছে— ২০,৪২,০০০ জন।
১৯৫১—১৯৬০ সাল পর্যন্ত এদেশে এসেছে— ১১,৩০,০০০ জন।
১৯৬১—১৯৭০ সাল পর্যন্ত এদেশে এসেছে— ১০,৩৭,০০০ জন।

অন্য একটি পরিসংখ্যানে[৩] ১৯৪৬—১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল ৪২,৫৯,৬০৪ জন। যা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন জনসংখ্যার নিরিখে উদ্বাস্তু ছিল ১৩.৫৪% মানুষ। শুধু তাই নয় ১৯৭০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে এই উদ্বাস্তু স্রোত ক্রমাগত ঘটেই চলেছে।

বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু সমস্যা কেন্দ্রিক নাটকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারেরা উদ্বাস্তু সমস্যাকে তাদের নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটক এমনই এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সমস্যার করুণ আলেখ্য। নাটকটি 'উত্তর সারথী'-র প্রচেষ্টায় ১৯৫১ সালের ২১শে জুন প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এরপর 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটক সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকার জানিয়েছেন—

> "ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যা, বেদনা নিয়ে এই নাটক। নামটা ইচ্ছে করে 'নতুন ইহুদী' রেখেছিলাম। কিছুটা প্রতীকী। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মানি থেকে ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। ঠিক সেই রকমই অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের অত্যাচারিত মানুষদের। তাই নাটকের নাম 'নতুন ইহুদী'।"[৪]

'নতুন ইহুদী' নাটকের মোট দৃশ্য সংখ্যা সতেরটি। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাই পূর্ব পাকিস্তানের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের করুণ চিত্র। বিপর্যস্ত এই পরিবারের অভিভাবক মনমোহন ভট্টাচার্য। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক। স্ত্রী অন্নপূর্ণা, দুই পুত্র দুইখ্যা, মোহন এবং একমাত্র কন্যা পরীকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। জ্যেষ্ঠ পুত্র খোকন দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দেয়। কিন্তু দেশভাগের পরেই সংস্কৃত ভাষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে ছেঁটে ফেলা হয়। এর ফলস্বরূপ তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। চাকরি হারিয়ে মনমোহনবাবু পরিবার নিয়ে এক গভীর সংকটে পড়ে যান। বাল্যবন্ধু মীর্জার সঙ্গে কথোপকথনে মনমোহনবাবুর শোচনীয় অবস্থা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন নাট্যকার—

> "অখন যে কি করি, বৃদ্ধ বয়সে কই গিয়া চাকরি পাই— তিনিই জানেন। এইবার থেইক্যা উপবাস আর কি! আইজ যদি খোকন বাইচা থাকত! একটা পাগল, একটা পোলাপান—বয়স্থা মাইয়া—এই সব লইয়া আমরা বুড়াবুড়ি কি যে করুম কিছুই বুঝিনা। মাত্র দুই মাসের মায়না সম্বল নিয়া নি মাইন্‌সে একটা বিদেশে অচেনা জায়গায় যাইতে পারে?"[৫]

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সেদিন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা তো এমন খণ্ডিত স্বাধীনতা চায়নি। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিল এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা পেলাম খণ্ডিত, রক্ত-কলুষিত পচা-গলা স্বাধীনতা। তাইতো ক্ষোভে, দুঃখে-কষ্টে মোহন বলতে বাধ্য হয়েছে—

> "... আর বড় দাদারা শুধু শুধু বোকার মতন হুজুগে প্রাণ দিছে— আমি হইলে এই স্বাধীনতার লেইগা পরাণ দিতাম না।"[৬]

মোহন এবং মীর্জার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দেশভাগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া নাট্যকার মুন্সীয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষ দেশভাগ চায়নি, তারা চেয়েছিল সুখে-দুঃখে একসঙ্গে বাস করতে। তাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ মৌলবি মীর্জার স্পষ্ট উক্তি—

> "দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইন্‌ষের মনে। জমির উপুর দেওয়াল তুলছে— মনে য্যান তুলতে না পারে। আমার পোলায় আর তুই লড়াই না কইরা বাইচা বইরতা থাকবি— আমারে জবান দিয়া যা, কসম্ খাইয়া যা বেটা।"[৭]

মৌলবি মীর্জার এই উক্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ভৌগোলিক বিভাজন রাজনৈতিক দিক থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু মনের দিক থেকে দুই দেশের মানুষকে তো কখনোই পৃথক করতে পারেনি।

আলোচ্য নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যের পর থেকেই দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যার এক নির্মম ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। মনমোহন ভট্টাচার্য এবং নমঃশূদ্র চাষী কেষ্ট জমি-জমা, বাস্তুভিটা বিক্রি করে পাড়ি দেন পশ্চিমবঙ্গে এবং আশ্রয় নেন শিয়ালদা স্টেশনে। এখানে কাপড় দিয়ে ঘর বানিয়ে কোনরকমে তাদের দিনযাপন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এক স্বচ্ছল পরিবারে বড় হয়ে ওঠে দুইখ্যা, মোহন এবং পরী। তাই শিয়ালদার মতো অচেনা জায়গা এবং অচেনা পরিবেশে তারা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না। পরি স্নান করতে গিয়েও নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরীর কথায়—

> "নাওন যায় ওইর মইধ্যে? চাইরদিকে লোক—টেগ্যাইয়া আছে! খালি খুকী তুমি কই থেইক্যা আইছ—কে কে আছে? আর জলের লেইগ্যা মারামারি; আমি নামু না..."[৮]

যেসমস্ত উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে স্টেশন চত্বরে আশ্রয় নেয় তাদের রেশন ও ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের এই সামান্য সাহায্য অনেক সময়ই প্রহসনে পরিণত

হয়। কারণ তার জন্য হাজার জায়গায় নাম লেখাতে হয় এবং হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের। তাই মোহন অতীষ্ট হয়ে বলে ওঠে—

> "কতজনার কাছে নাম লেখামু কনতো? ওই হাজার রকমের নিশান ঝুলাইয়া স্টেশন সাজাইছেন—তার হাজারটা সেবা সমিতির খাতায় আমার নাম লেখা আছে।"[৯]

সপ্তাহখানেক স্টেশনে কাটানোর পর মনমোহন ভট্টাচার্য স্থায়ীভাবে থাকার জন্য কুড়ি টাকা ভাড়া বাবদ একটি ঘর ঠিক করেন। কিন্তু এর জন্য পণ্ডিত মশাইকে একশো টাকা সেলামী দিতে হয়। অন্যদিকে দেখা যায় কেষ্ট প্রলোভনে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তার কষ্টার্জিত তিনশো টাকা জমির লোভ দেখিয়ে ঠকবাজরা আত্মসাৎ করে নেয়।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের সূচনায় আমরা দেখতে পাই এই উদ্বাস্তু সমস্যা যেন তার নির্মম চেহারা নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। মনমোহনবাবু হাজার চেষ্টা করেও কোনোভাবেই একটি চাকরি জোগাড় করতে পারেননা। উপবাসী পরিবারের কথা ভেবে পণ্ডিত মশাই দুই যুবকের কাছে যজমানি করতে গেলে যুবকদ্বয় দ্বারা তাঁকে অপমানিত হতে হয়। শুধু তাই নয় তাঁকে শুনতে হয়—

> "গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বেরুলেই ব্রাহ্মণ! বেড়ে হয়েছে বাবা!"[১০]

শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে হালুইকর ব্রাহ্মণের জোগাড়ে হয়ে একটাকা বারো আনার বিনিময়ে মনমোহনবাবু বিয়ে বাড়িতে যেতে সম্মত হন। কিন্তু সেখানেও খাবার চুরি করার সন্দেহে অপমানিত হন এই সহজ-সরল মানুষটি। তিনি ক্ষোভে, দুঃখে-কষ্টে পরিশ্রমের টাকা না নিয়েই বাড়ি চলে যান। তাইতো তাঁকে বলতে শোনা যায়—

> "কতদিন লোকেরে আনন্দ কইরা খাওয়াইছি—খাইতে না পারলে বাইন্ধা দিছি। সেই দিন বেশি পুরাণ হয় নাই। কিন্তু সেই ছান্দা—সেই অন্ন যে এত চোখের জলে কিনতে লাগবো, ভাবতেও পারি নাই। সেই ভাত যে এত নোনা—সেই ভাতের যে এত জ্বালা।"[১১]

পূর্ব পাকিস্তানের স্বচ্ছল জীবনের কথা মনমোহনবাবুর এই সংলাপে সষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। স্মৃতির সরণী বেয়ে সেই সুন্দর দিনগুলির উদ্বাসনই শুধু এই সংলাপের প্রধান বিষয় নয়; সমাজের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্নও যেন এখানে প্রকাশিত। যে প্রশ্ন জানতে চেয়েছে, দেশভাগের বলি এই সাধারণ মানুষগুলির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কে? অন্যদিকে দুইখ্যা কোনোভাবেই এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনা। সামান্য ইচা মাছ দিয়ে ভাত তার পছন্দ হয়না। তাই রেগে ভাতের থালা ফেলে দেয়। এতে পণ্ডিত মনমোহনবাবু প্রচণ্ড রেগে যান এবং দুইখ্যার গালে চড় বসিয়ে দিয়ে বলেন—

> "কি হারামজাদা! ভাত ফালাইয়া দিলি? দেশ ভাতের কাঙাল আর তুই...আর তুই।"[১২]

হাজার দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও অন্নপুর্ণা ছোটছেলের মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেননা। তাই তাঁর ইচ্ছে মোহন আবার পরীক্ষা দিক। কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধকে মোহন এড়াতে পারেনা। ঘরে বৃদ্ধ বাবা-মা, বড় ভাই আধপাগল এমতাবস্থায় সে সংসারের হাল না ধরলে সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। পরিবারের এই দুঃসময়ে মোহন তার মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—

> "তুমি আর পরীক্ষার কথা কইও না। কিষ্টগো ওইখানে কারখানায় চাকরির খবর পাইছি—সেই কাজে লাইগা যামু।"[১৩]

দুইখ্যা আধপাগল হলেও পরিবারের প্রতি একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। তবে সে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বেছে নেয় চুরির মতো সহজ-সরল পথ। দুইখ্যা ছোটবোন পরীর বিয়ের ব্যাপারে সচেতন। তাই চুরি করে হলেও বোনের বিয়ের জন্য সে টাকা জমায়।

মোহন তার কর্তব্যবোধের কথা ভেবে কুলির কাজ করতেও পিছুপা হয়না। অবশেষে মোহন একটি রঙ কারখানায় চাকরি পায়। কিন্তু সেই কারখানায় তখন ধর্মঘট চলছিল। ফলে মোহন উপলব্ধি করতে পারে তার মতো অসহায় অবস্থা আরও অনেকের। তাছাড়া নিজে বাঁচার জন্য সেই কারখানায় চাকরি নিলে ধর্মঘটীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাই রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্রের পরামর্শে যখনই তার চৈতন্যোদয় হয় তখনই মোহন চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। তবে মোহন কিছু প্রশ্ন রাখে মহেন্দ্রের কাছে তথা গোটা সভ্য সমাজের কাছে—

> "আমাগো ছোট ছোট ছেলেরা পকেট কাটে, পড়াশুনা করেনা— ট্রামে-বাসে বিনা পয়সায় চুরি কইরা চড়ে— আমাগো বউ-ঝিরা বেয়াব্রু হইয়া রাস্তায়, দোকানে, হাটে, বাজারে উদরান্নের সংস্থানের লেইগা সৎ-অসৎ নানা রকম গোপন বৃত্তি গ্রহণ করে, প্রমাণ হয় আমরা ইতর—আমরা নীতিহীন। কিন্তু কেন?"[১৪]

দশম দৃশ্যে পিতার জন্য ঔষধ ও পথ্যি আনতে গিয়ে ভাগ্যান্বেষী যুবক যতীনের সঙ্গে পরিচয় হয় পরীর। যতীন নিজে থেকে পরীকে তার পিতার জিন্য ফল-মূল, ঔষধ কিনে দেয়। এর ফলে পরীকে তার ঘরে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যতীন পরীকে বড়বাবু রমেশ চক্রবর্তীর কাছে যাওয়ার কুপ্রস্তাব দিলেও পরী তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। নানারকম প্রলোভন দেখিয়েও যতীন বশে আনতে পারেনা পরীকে। কারণ পরী তার আত্মসম্মান ও লজ্জাসম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। পরীর একথায় যতীন উত্তর দেয়—

> "যদি লোক দেখানো সতীপনা না করতে তো তুমিই ওদের খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারতে। ...এখন বেশি সতীপনা না ফলিয়ে আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো।"[১৫]

শুধু তাই নয় যতীন আরও বলে—

> "নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ—মান-সম্ভ্রম আর আছে কিনা? ওই শাড়িতে দেহের সম্ভ্রম ঢাকা যায়? যায় না! ...সেটা বাঁচাতে হলেও শাড়ির দরকার, টাকার দরকার।"[১৬]

যতীনের এই সংলাপের মাধ্যমে গৃহহারা উদ্বাস্তু যুবতী মেয়েদের বাস্তব সমস্যার মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। উদ্বাস্তু সমস্যার যে অবশ্যম্ভাবী ফল দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্য যে মেয়েদের মান-সম্ভ্রমকেও পথে নামিয়ে এনেছিল তারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই নাটকটি। যতীনের কথা শুনে পরী অপমানিত বোধ করে। কারণ সে নিরুপায়। তাই দুঃখে-কষ্টে, অভিমানে মোহনকে বলে—

> "আমি তো মাইয়া লোক—সাধ আল্লাদ না থাকুক—আমার তো লজ্জা কইরা একটা বস্তু আছে। না তাও খোওয়াইতে লাগবো। এই দেহের লজ্জা যদি ঘুচাইতে পারতাম।"[১৭]

আসলে এই আক্ষেপ শুধু পরীর একার নয়, পরীর মতো অসংখ্য বাস্তুহারা যুবতী মেয়েদের অন্তরের মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই আত্মসম্মানবোধ বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা পরী। দারিদ্র্য তার ভীত নাড়িয়ে দেয়। মোহন যখন দুইখ্যার চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড় করতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তখন কিন্তু পরীই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরি বলে ওঠে—

> "আত্মসম্মান? আত্মসম্মান? ... আমি দিমু ... আমি কিন্তু একজনের থেইকা—"[১৮]

দারিদ্র্যের সঙ্গে অনবরত সংগ্রামরত মানুষগুলির আত্মসম্মানবোধকে পরীক্ষা করার জন্য নাট্যকার যতীন চরিত্রের অবতারণা করেছেন। তাই সে বারংবার সেই অর্থহীন আত্মমর্যাদাবোধকে তীব্র প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছে—

> "কে দিল তোমার ভদ্রতার দাম? তোমার বাবার চিকিৎসা হয় না কেন? তোমার ভাই কিসের তাড়নায় ট্রামে চাপা পড়ে? অভাব... অভাবই একমাত্র পাপ... যার ফলে তোমার মাকে বাঁধানো নোয়া খুলে দিতে হয়েছে।"[১৯]

পরীর আত্মসম্মানবোধ পরাজিত হয়, জয়ী হয় দারিদ্র্য। যতীনের কাছ থেকে পরী একশো টাকা ধার নেয়। শুধু তাই নয়, পরিবারের প্রয়োজনে ঘর ছাড়তেও বাধ্য হয়। নাট্যকার এখানে উদ্বাস্তু সমস্যার পাশাপাশি নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানও নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষপর্যন্ত দুইখ্যার মৃত্যু, পরীর গৃহত্যাগ এবং মনমোহন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকটি পরিণতি লাভ করে। মনমোহনবাবু তাঁর পূর্ব পাকিস্তানের সহজ-সরল নিস্তরঙ্গ জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে বর্তমানের সংগ্রামী জীবনের মূল্যবোধকে কিছুতেই মেলাতে পারেননি। তাঁর শরীর ও মন কোনটাই এই জীবন সংগ্রামে সায় দেয়নি। একমাত্র আশার প্রদীপ হয়ে রয়ে গেছে মোহন। এরাই আগামী দিনে হাজার আলোর রোশনাই প্রজ্জ্বলিত করবে। মহেন্দ্র সেই প্রত্যাশার কথাই শুনিয়েছে—

> "... মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বার্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের শাস্তি দেবে। হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি খতম করবেই, ভাগ্যের গোলামী তুমি আর বরদাস্ত করবে না কিছুতেই।"[২০]

আলোচনার শেষে বলতে হয়, দেশভাগ-পরবর্তী ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু মানুষগুলির বেঁচে থাকার লড়াই, দুর্দশার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে একটি বিশেষ পরিবারের আশ্রয় নিয়েছেন নাট্যকার। শুধু তাই নয় এই বিশেষ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সংগ্রামী জীবনকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। একটি পরিবারের মধ্য দিয়ে সমগ্র উদ্বাস্তু, অসহায় মানুষদের প্রকৃত চেহারা সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। আর এখানেই নাটকটির সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে কমলকুমার সান্যালের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> "মোহনের জীবনবোধ ও বলিষ্ঠতা বাংলা নাটকে এর আগে দেখা যায়নি।... নাট্যকার বারে বারে আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে। দেশভাগ পরবর্তী অসংখ্য নতুন সংসার এভাবেই ধ্বংস হয়ে গেছে। নাট্যকার সচেতনভাবে রূঢ় বাস্তবের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সলিল সেন আর কোন নাটক না লিখলেও 'নতুন ইহুদী'-র জন্য বিখ্যাত হয়ে থাকতেন।"[২১]

সুতরাং একথা বলা যেতেই পারে দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জীবন-যন্ত্রণার দলিল হিসেবে 'নতুন ইহুদী' নাটকটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

তথ্যসূত্র :

১. http://www.unrefugees.org/what-is-a-refugee/
২. রহমান, মিজানুর, 'দেশভাগ বাংলা নাটক', শ্রীভারতী প্রেস, ১ম সংস্করণ, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ২১
৩. ভট্টাচার্য, তাপস, 'বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন', পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ, ১৪১১, কলকাতা, পৃ. ০৩
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা(সম্পাঃ), সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য, দে'জ, ১ম সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ০৯
৫. তদেব, পৃ. ২৭
৬. তদেব, পৃ. ৩০
৭. তদেব, পৃ. ৩১
৮. তদেব, পৃ. ৩২
৯. তদেব, পৃ. ৩৪
১০. তদেব, পৃ. ৪৮
১১. তদেব, পৃ. ৫৩
১২. তদেব, পৃ. ৪০

১৩. তদেব, পৃ. ৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ৬৪
১৫. তদেব, পৃ. ৭৮
১৬. তদেব, পৃ. ৭৮
১৭. তদেব, পৃ. ৭৯
১৮. তদেব, পৃ. ৮০
১৯. তদেব, পৃ. ৮২
২০. তদেব, পৃ. ৯৬
২১. সান্যাল, কমলকুমার, 'বাংলা নাটক সমীক্ষা', বর্ণালী প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃ. ১০৫